হামার ছওয়াটা মানুষ হইবে

কাজী এ এম তুষার আলম
এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এইচআর এন্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ।

নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের সামনে অপেক্ষমান আমি ও আমার চাচাত ভাই রুবেল, পাশেই অপেক্ষমান আমাদের বাহন অকটেন চালিত দ্বিচক্রযানটি। আমার অপেক্ষা করার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে কিন্তু রুবেল সামান্যই জানে বিষয়টা নিয়ে। এক ধরনের রোমাঞ্চ কাজ করছিল আমার মনে। এ ধরনের যাত্রা আমার প্রথম নয়। তবুও মনের মধ্যে কৌতূহলের শেষ নেই। অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটল। ম্যাজেন্টা রঙের টি শার্ট ও সাদামাটা একটি প্যান্ট পরে ১৭ বছর বয়সী এক কিশোর এসে আমাকে সালাম জানাল। সালামের উত্তর দিতে দিতে তার দিকে আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। শীর্ণ চেহারার মজনু মিয়ার চোখ দু'টোর ঔজ্জ্বল্য তার প্রকৌশলী হবার অদম্য ইচ্ছেটাকে ব্যক্ত করে স্পষ্টভাবে। কোনোরকম সময় অপচয় না করেই তাকে নিয়ে রওনা দিলাম তার বাড়ি পশ্চিম বেরুবাড়ির উদ্দেশে, খুব বেশি দূরে না, দুই কিলোমিটার রাস্তা হবে। আর কিছুদূর এগুলেই তাদের প্রিয় বেরুবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এবং তারপরেই দুধকুমার নদী সীমান্তের প্রায় কাছ ঘেঁষে। আরও একটু এগুলেই বানরভিটার ফেলানীর বাড়ি। হতভাগা কিশোরীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস এখনো মানুষকে শিহরিত করে।

ঈদ আসে একরাশ আনন্দ নিয়ে। এ আনন্দের টানে আমরা ঘরমুখো হই স্বজনের সাথে ঈদের আমেজটা বিনিময় করতে। ঈদের দিন বাড়ির স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের সাথে সময় ব্যয় করে ঈদের পরের দিন ১৩৯ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গেলাম এই কিশোরদের সাথে ঈদ আনন্দ ও কুশল বিনিময় করতে। এই কিশোরদেরই একজনের নাম মজনু মিয়া। আমি অবাক হলাম, তার বাড়িতে ঈদের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখতে পেলাম না। মজনু মিয়ার মা বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁর মজুরীর টাকা সংগ্রহ করছে। তাঁরই কুড়েঘরে সেলাই করা কাপড় পরে উক্ত গ্রামের কিছু কিশোরী, যুবতী ঈদ আনন্দে মত্ত। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ পথে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক রিক্সার প্যাডেল থেকে নেমে সালাম জানালেন, আমি মজনুর বাবা। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না ভদ্রলোকের পেশা। তিনি যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে আমাদের একখানা ঘরে বসতে দিলেন। বিদ্যুৎ নেই তবুও যেন আলোর অভাব নেই। ঘরের চতুর্দিক দিয়ে অসংখ্য ছিদ্র যেখান দিয়ে আলো অবলীলায় প্রবেশ করছে। বিছানায় বসতে বসতেই নজর পড়ল একখানা টেবিলের উপরে দু-একখানা বই ও গুটিকয়েক হাড়ি-পাতিল। সবমিলে যে এগুলোই তাদের সম্পত্তি, এগুলোই তাদের সম্পদ। রোদের আলোর কণাগুলো

পরম মমতায় চুম্বন একে দিয়ে যাচ্ছে ঘরে থাকা সম্পদগুলোকে। রুবেল যেন খানিকটা হতাশ হলো। বিন্দুমাত্র বিশ্বাস হচ্ছিল না এতদূর আসার পর এই রকম একটি বাড়িতে এসে উঠব। ওর মুখ ফসকে একটি লাইন বেরিয়েই গেল, এইখানে কী! আমি একটি মুচকি হাসি দিয়ে বললাম- একটু অপেক্ষা কর, সব বুঝতে পারবি।

নীলফামারী থেকে যাত্রা শুরু করার সময় রুবেলকে শুধু বলেছিলাম, নাগেশ্বরীতে দু'জন ছাত্রের সঙ্গে দেখা করব। রুবেলের আয়োজনের যেন কমতি নেই। সানগ্লাস, পানি, সামান্য খাবার, বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য রেইনকোট ইত্যাদি ইত্যাদি। দু'পাশের বৃক্ষরাজি চিরে আমরা যখন নীলফামারী-রংপুর হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন চোখে পড়ল ছোট ছোট পিকআপগুলোতে শিশু-কিশোরের ঈদ উল্লাস, চিৎকার, চেচামেচি। পথিমধ্যে দু'একটা দুর্ঘটনাও আমাদের চোখে পড়ল। খানিক পরেই স্বস্তি পেলাম হাইওয়ে পুলিশবাহিনী এসব পিকআপগুলোকে আটক করে রাখছে হাইওয়ের পরিবেশ রক্ষা করার জন্য। ঈদ উল্লাস করা ভালো, কিন্তু এমন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ উল্লাসের পরিণতি ভালো নয় বলে আমাদের মনে হলো, কারণ এতে জীবনের ঝুঁকিও থাকে। পথিমধ্যে পুলিশভাইদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাশের ডোবায় কিছু পদ্মফুল ও ফড়িংয়ের উপর ফটোগ্রাফিও করলাম। খুবই স্বাভাবিক, ফটোগ্রাফির এই অভ্যাসটা হয়েছে ব্যাবিলন ফটোগ্রাফি ক্লাবের জন্য। এই নিয়ে আমি বেশি কিছু লিখলাম না কারণ এখন পর্যন্ত ফটোগ্রাফিটা ঠিকমতো আত্মস্থ করে উঠতে পারিনি। শুধু ছবিই তুলে যাচ্ছি।

রংপুরে এসে সামান্য বিশ্রাম নিলাম। খুবই অপ্রয়োজনীয় মনে করেছিলাম রুবেলের এই ব্যাগভর্তি আয়োজনকে, কিন্তু দেখলাম এটা কাজে লাগছে বেশ। ক্ষিধে সামান্য মিটিয়ে রওনা হলাম কুড়িগ্রামের উদ্দেশে। গুগলের দেয়া তথ্যমতে আরো ১ ঘন্টা ২৮ মিনিট সময় লাগবে কুড়িগ্রাম যেতে। রুবেল খানিকটা হতাশ হলেও তার ভালোই লাগছে ভ্রমণটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বহুল আলোচিত তিস্তা নদীর সেতু। এখানে কিছুক্ষণ না দাঁড়ালেই নয়। সেতুর পশ্চিমে বয়সের ভারে ন্যুব্জ বেইলি ব্রীজটি এখনও কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেল চলাচলের জন্য। থাঙ্গু, ইয়মথাঙ্গু এবং দোখনা পর্বতমালা থেকে উৎপত্তি হয়ে তিস্তা কাংশেতে এসে তিস্তা নাম ধারণ করে রংপ, দার্জিলিং-পশ্চিমবাংলার সীমান্ত ধরে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, দহগ্রাম হয়ে বাংলাদেশে তিস্তা নামেই প্রবেশ করে। তিস্তায় পানি কমে যাওয়া দেখে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতকে দুয়োবাদ দেয়া ছাড়া আমাদের যেন কিছুই করার নেই। পাশেই হেঁটে যাওয়া একজনকে শুধালাম-
-ভাই পানি কতদূর পর্যন্ত বাড়ে।
-সরকার জানে।
হাঃ হাঃ করে হাস্যধ্বনিও শুনতে পেলাম পাশের এক লোকের মুখে। আমাদের আর বলার কিছু থাকল না।

আবারো কিছুক্ষণ ফটোগ্রাফি করে রওনা দিলাম গন্তব্যের উদ্দেশে। কিছুদূর আসার পরেই

মনে হলো আমরা হাইওয়ে ছেড়ে বাইপাস রাস্তা দিয়ে গেলে ১৫ কিলোমিটার রাস্তা কমবে। অথচ লালমনিরহাট পাটগ্রাম হাইওয়ে দিয়ে গেলে তিস্তার আরেক শাখা সতী নদীর দেখা মিলবে। লোভ সংবরণ করে রাস্তা কমানোর উদ্দেশ্যেই লালমনিরহাট-কুড়িগ্রাম বাইপাস রাস্তায় নেমে পড়লাম। সিঙ্গের ডাবরিতে ঝমঝম করে বৃষ্টি আসলো। রেইনকোট গায়ে দিয়ে আবারো রওনা দিলাম আর রুবেলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখ দু'টো ভরে গেল। টোগরাইহাট পৌঁছানোর পর একপাশে রেলপথ, আরেকপাশে সড়কপথ। পাশাপাশি দুই পথেই অসংখ্য গাছগাছালি ও পানি ভর্তি নিচু জমি চিরে পৌঁছালাম রাজারহাট। অন্যরকম রূপ-সৌন্দর্যে ভরপুর কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাটে পানিতে তলিয়ে যাওয়া নীচু জমি দেখে একটু সংশয় হলো। ফসলি জমিগুলো পানির নীচে তলিয়ে আছে, সামনেই আশ্বিন-কার্তিক মাস (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য নভেম্বর) যখন আমন ধানের উৎপাদনের সময়। বুকে আশা বেধে রাখলাম নিশ্চয়ই পানি অতি শীঘ্রই নেমে যাবে। যদি এ সময় যথেষ্ট পরিমাণ শস্য উৎপাদন না হয় তাহলে গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী এবং রংপুরের কিছু কিছু অঞ্চলে শস্যাভাব দেখা দিলে অভাব অর্থাৎ মঙ্গার উৎপত্তি হয়। তিস্তাতে পানিবণ্টনটাও ঠিকমতো হয় না এখন আর। কখনো কখনো তিস্তার বুকে ছেলেদের ফুটবল খেলতেও দেখেছি। আবার পরের দিন অথৈ পানি দেখেছি গজলডোবা তোতা বাঁধের কল্যাণে। যাহোক, অতশত চিন্তা না করে প্রকৃতির বৈচিত্র্যটাকে উপভোগ করতে থাকলাম আর মাঝে মাঝেই কিছু সেলফি নিলাম। ডানদিকে কুড়িগ্রাম-চিলমারী হাইওয়ে এবং সোজা কুড়িগ্রাম-ভুরুঙ্গামারী রোড। মনে পড়ে গেল সেই বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গান-

ওকি গাড়িয়াল ভাই
হাকাও গাড়ি তুই চিলমারী---।

ভাবতে ভাবতেই পৌছে গেলাম ধরলা নদীর সেতুতে। তিস্তা সেতুর অবিকল কারুকাজে গড়া এই সেতুটি। খুবই অবাক হলাম যখন দেখলাম এখানে বিশাল এক এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে ধরলা রিসোর্ট। ভারতে ধরলারা নামধারী নদীটি অতটা প্রশস্ত না হলেও বিস্তৃতি দীর্ঘ। সিকিমের কুপুপ ও বিতাং লেক থেকে জলঢাকা নদী এবং নেওরাভেলি জলপাইগুড়ি থেকে মূর্তি নদীর উৎপত্তির পরে মিলিত স্রোতে জলঢাকা নাম ধারণ করে অতঃপর ধরলারার সাথে মিলিত স্রোতে সিংঙ্গিমারি, ফুলেশ্বরী এইসব নাম ধারণ করে বাংলাদেশে ধরলা নামেই প্রবেশ করে।

রুবেলের ঈদ আনন্দ যেন বহুগুণ বেড়ে গেছে। সে মাঝে মাঝেই আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে মোটেও ভুল করছে না সাথে করে কুড়িগ্রাম নিয়ে আসার জন্য। মজনু মিয়ার বাড়িতে বসে তার হতাশার কারণ বুঝতে আমার আর বাকি রইল না। আমি তার দিকে চেয়ে আর বিশেষ কিছু না বলেই চলে গেলাম মজনু মিয়ার বাড়ির পিছনে অত্যন্ত অবহেলায় দাঁড়িয়ে থাকা দোকানঘরটিতে। মজনুর মা দিনান্ত পরিশ্রম করেন স্বল্পপুঁজির এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিতে। তাঁর চোখে মুখে আনন্দ স্পষ্ট হয়ে উঠল ছেলের শিক্ষার নিশ্চয়তা নিয়ে। মাঝে মাঝেই আমাদেরকে ধন্যবাদ দিতে এতটুকু কার্পণ্য করেননি ভদ্রমহিলা। ছেলের

পড়াশোনায় যাতে কোন ক্ষতি না হয় তাই তিনি ছেলেকে রেখেছেন দুই কিলোমিটার দূরে কলেজের কাছাকাছি একটি মেসে। বাবা-মা দুজনেই অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন ছেলেকে শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য।

এ বছর এপ্রিলে আমার প্রথম সুযোগ ঘটে অদম্য মেধাবী আর নিরন্তর সংগ্রামী মানুষগুলোর অন্দরের সংগ্রাম চিত্র দেখবার। নীলফামারীর সিদ্দিকুর ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। একই ঘরে এক পাশে গরু, আরেক পাশে সিদ্দিকুর রহমানের পড়াশোনার টেবিল। মা-হারা এই কিশোরটি বেড়ে উঠেছে অত্যন্ত সংগ্রাম করে। তার সৎমা গৃহিনী ও বাবা একটি গ্রাম্য মসজিদের খাদেম। তার মা ও বাবা শুধু ভালোবাসাটাই দিতে পারেন সন্তানের জন্য এর বেশি কিছু নয়। তাদের এই ভালোবাসাটাও অমূল্য তার জন্য। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি বেশ আগ্রহ থাকায় পড়াশোনা থমকে যাওয়ার এতটুকু সুযোগ দেয়নি এই কিশোরটি। পড়াশোনা করাটা তার জন্য ছিল বেশ দুরূহ। ছেলেবেলা থেকেই পরের বাড়িতে লজিং মাস্টার হিসেবে কাজ করে খাবার, আবাসন ও পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করেছে সে নিজেই। তার পরিশ্রমের মূল্য হিসাব করার মতো দুঃসাহস আমার নেই। তার গ্রামে স্কুল আছে কিন্তু কলেজ নেই। দূরবর্তী নীলফামারী কলেজে পড়াশোনা করতে গেলে যে খরচ হবে তার যোগফল মেলাতে গেলেই সিদ্দিকের চোখ যেন কপালে উঠে যায়। সে বুঝতে পারে তার সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই। তারপরও তাকে আমি এতটুকু হতাশ হতে দেখিনি। তার মা আশির্বাদের বান ছুড়ে দিলেন আমার দিকে। কারণ একটাই, যখন তারা কোনো উপায়ন্তর দেখছিল না এমনই সময় আমরা শিক্ষাবৃত্তির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম এই কিশোরটির প্রতি। সিদ্দিকের আপাততঃ পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না এই তাদের প্রশান্তি। সিদ্দিকের মা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "হামার ছওয়া পড়াশোনা করি বড় অফিসার হইবে।"

সাবলীল উচ্চারণে সিদ্দিকুর তার জীবনী বলছিল আমার কাছে। আমি লক্ষ্য করলাম তার ঠোঁটের কোণায় এক চিলতে হাসি। যে হাসির অর্থ- এত সহজে হার মানব না। পড়ন্ত দুপুর বেলায় বাড়িতে কোনো খাবারের যোগান না দেখে তাকে চেপে বসালাম আমার দ্বিচক্রযানে। উদ্দেশ্য কোনো হোটেলে আমরা খাওয়া সেরে রওনা হব আরেক ছাত্র আল-আমিনের বাসায়। বড় তৃপ্তির সাথে সিদ্দিকুর খাচ্ছে মাছ-মাংস যা পাচ্ছে সবই। অশ্রুসজল হওয়া থেকে নিজেকে অতি সাবধানে সংবরণ করলাম। আমার এ লেখনিতে খুব সামান্যই বিবরণ দেয়া সম্ভব তাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনের সাথে যুদ্ধ করে পড়াশোনা চালিয়ে যাবার সামর্থটাকে। আল-আমিন মাতৃবিয়োগের পরে বোনের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করছে। আল-আমিনের দুলাভাই এক অজপাড়াগাঁয়ের সামান্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। জানতে পারলাম, আল-আমিনকে পড়াশোনার সাহস যুগিয়েছে তার দুলাভাই। ফেরার সময় তাই ভদ্রলোককে আমি ধন্যবাদ দিতে এতটুকু কার্পণ্য করিনি তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য। আবারো একবার তাঁকে সালাম জানালাম। তিনিও সিদ্দিকুরের মায়ের মতো একই আশা প্রকাশ করলেন ছেলেপ্রতীম শ্যালককে নিয়ে।

মজনু মিয়ার মায়ের দোকানের খবর নিতে নিতেই আগমনবার্তা শুনলাম মোর্শেদ আলমের বাবার। মজনুর বাড়ির কাছাকাছিই মোর্শেদের বসতভিটা, তার বাবা একজন পান দোকানদার। তাদের স্কুলের পাশেই তার ছোট্ট দোকান। মজনু মিয়ার সাথে একই কলেজে অধ্যয়নরত মোর্শেদ। মোর্শেদের বাড়িতে যেয়ে দেখলাম একই চিত্র। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রয়োজনের পাশাপাশি একটি জিনিস প্রয়োজন না থাকলেও সব সময় তাদের পাশে থাকে অভাব নামক এই দ্রব্যটি। মোর্শেদের মা দিনান্ত পরিশ্রম করেন হাঁস, মুরগী, গরু পালন করে ছেলে ও মেয়ের পড়াশোনার খরচ যোগাতে। আমার এ ধরনের যাত্রায় সামান্য যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে তা দুর্মূল্য।

ভাই এই গরুটার দাম কত?
চল্লিশ হাজার টাকা- বিক্রেতা উত্তর দিলেন।
ভাই একজন দরিদ্র মানুষকে গরুটি বাছুরসহ দান করব এক কোম্পানির পক্ষ থেকে। গরীব মানুষ দোয়া করবে। এরকমভাবেই দরদাম চলছিল পলাশবাড়ির নতুন গরুরহাটে। আমার সাথে পাতানী খালার ছেলে। পাতানী খালার মেয়ে মোর্শেদা অবনী নীট ওয়্যারের (ব্যাবিলন গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) শ্রমিক। অনেক দরদামের পর আমরা একটা সমঝোতায় পৌঁছে গরু ও বাছুর নিয়ে রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশে। পথিমধ্যে পাতানী খালার ছেলের হাকডাকের শেষ নেই। বাড়িতে পৌঁছে অর্ধ-শতক জমির উপর কুঁড়েঘরটায় কোথায় থাকবে এই প্রাণীটি কোথায় আর থাকবে এই পরিবারের সদস্যগুলো, এ নিয়ে সমাধান দিলেন পাতানি খালা নিজেই। তার রান্নাঘরের অর্ধেক অংশে বাছুরসহ গরুটির আশ্রয় মিলল। মোর্শেদার মেয়ে নানীর কাছে থাকে যাতে পড়াশোনা করতে পারে। পাতানী খালা গরু-বাছুর পেয়ে যারপরনাই পুলকিত। সাথে সাথেই মোর্শেদাকে ফোন দিয়ে জানিয়ে দিলেন নাতনীকে নিয়ে চিন্তা না করতে। তাদের এই আনন্দে আমারও চোখের কোণে ২/ ৪ ফোঁটা মুক্তোদানা খিলখিল করে হাসতে থাকে চিবুকে লেপ্টে যাওয়ার জন্য। এখন আমি অনেকটা অভ্যস্ত তাদের এই সাধারণ আবেগে বলা বাক্যগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে।

রাশিদা খালার স্বপ্ন আরো অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর বাড়ি পীরগঞ্জ থানার খালাসপীর ইউনিয়নে। রাশিদা খালার মেয়ে আসমা অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড (ব্যাবিলন গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) এর শ্রমিক। রাশিদা খালা তাঁর মা এবং আসমার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে উক্ত অঞ্চলে বাস করেন। আসমা তার মেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব মায়ের উপর ছেড়ে দিয়েছে। রাশিদা খালার বাড়িতে আমার দু'বার যাওয়া হয়েছিল। প্রথমবার গাভি পরিদর্শন করতে এবং দ্বিতীয়বার তার উত্তরোত্তর উন্নতি দেখতে। বাড়িতে ঢুকতেই চমৎকার করে দোআঁশ লেপনে চাদর বিছানো উঠোন থেকে ঘর পর্যন্ত। গাভীটি এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে ও বাছুরটি ইচিং বিচিং খেলায় ব্যস্ত। রাশিদা খালার কুঁড়েঘরটি এখন আর কুঁড়েঘর নেই। ইট দিয়ে এটি এখন দশ ফুট বাই দশ ফুট একটি পাকা ঘর। তাঁর নাতনী নিয়মিত স্কুলে যায় এবং সে ভালোই পড়াশোনা করছে। রাশিদা খালার ইচ্ছে নাতনী শিক্ষিত হয়ে মানুষের মতো মানুষ হবে। নাতনিকে সর্বোচ্চ শিক্ষিত করার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি দু'হাত

ভরে আশির্বাদ করলেন গাভি দান করার জন্য। তিনি দৃঢ়ভাবে বলে উঠলেন- মোর নাতনী তোমাক ছাড়ি যাইবে, আরো বড় অফিসার হইবে, দোয়া করেন বাবা। তার এই সরল উক্তিটি আমাকে ছুঁয়ে দিল। আমি আসমার মেয়েকে অনেক আশির্বাদ করলাম।

সিদ্দিক বিএসসি। হ্যা, ভদ্রলোক এই নামেই পরিচিত। তাঁর সাথে দেখা না করলে যেন পুরো সফরটাই বৃথা। তাঁর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও যোগাযোগ ঠিক করা গেল না। দেখা মিলল মাহবুব স্যারের যিনি এই সিদ্দিক বিএসসি স্যারের সাথেই শিক্ষকতা করেন। মাহবুব স্যার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন- সিদ্দিক বিএসসি'র আত্মত্যাগের কথা। ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পে দু'জন ছাত্রকে নিয়ে সিদ্দিক বিএসসি এসেছিলেন বৃত্তির সাক্ষাৎকার দিতে। সাথে আরো দু'জন ছাত্র ছিল যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। কোনো এক ফাঁকে আবিদ স্যারের (পরিচালক, ব্যাবিলন গ্রুপ) নজর পড়ল ভদ্রলোকের উপর। আবিদ স্যার আমাকে জানালেন, এই ছাত্র দু'জনের শিক্ষক সিদ্দিক বিএসসি'র সাথে কথা বলবেন। আবিদ স্যারের সাথে সিদ্দিক বিএসসি'র কথপোকথনের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। সিদ্দিক স্যারের সাবলীল উত্তর দেখে আমি অভিভূত হলাম। তিনি তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেন যাতে তারা নিজেদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে ঐ গ্রামের নাম উজ্জ্বল করতে পারে। পশ্চিম বেরুবাড়ির যত জনের সাথেই কথা বলেছি সবারই একই কথা। সিদ্দিক বিএসসি'র মতো মানুষ হয় না। অজপাড়াগাঁয়ের এই গ্রাম থেকে কিছু ছাত্র-ছাত্রী আজ বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে ভাবতেই ভালো লাগে। আবিদ স্যার সিদ্দিক বিএসসি'র মোবাইল নাম্বারটা আমাকে রেখে দিতে বললেন।

এক সময় হন্তদন্ত হয়ে সিদ্দিক স্যার এসে হাজির হলেন। তিনি শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন, এ কারণে দেরি হলো বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। মোর্শেদ তার আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। আমি, রুবেল, সিদ্দিক বিএসসি এবং মজনু মিয়া একসাথে দুপুরের খাবার খেতে বসলাম নাগেশ্বরীর একটি রেস্তোরায়। খেতে খেতেই আরও দু'চারটে কথা লেনদেন হলো। সিদ্দিক স্যার জানালেন ২০১৫ সালে তাঁর স্কুলের একটি মেয়ে গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে পাশ করেছে। বলার সময় তাঁর কপালটি শীতের রঙিন চাদরের মতো দোল খেয়ে উঠল, পরম তৃপ্তি প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর কণ্ঠে।

ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প এমনিভাবে অনেক শিক্ষার্থীর স্বপ্নপূরণ করতে চলেছে। মোর্শেদ, আল-আমিন, সিদ্দিকুর, মজনু মিয়ার মতো আরো অনেক শিক্ষার্থী আজ অভাবকে জয় করে স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের স্বপ্নপূরণের কথাগুলো শুনতে যেমন ভালো লাগে তেমনি তাদের জন্য গর্ব হয়, শির উন্নত হয় তাদের মনোবল থেকে, তারা যেন সবাই এক একটি দীপ নিয়ে রাস্তায় নেমেছে আর তাদের সহায়তা করছে ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রমপ্রায় মুহূর্তে আশার আলো দেখাতে পেরে আমরাও যেমন গর্বিত তেমনি তাদের অভিভাবকরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে। শুধুমাত্র এসএসসি যারা পাশ করেছে শুধু তাদেরকে নিয়ে বসে নেই ব্যাবিলন পরিচালকমণ্ডলী। শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরাও যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে সেজন্য

তাদের মেধাবী ছেলে মেয়ের খরচ যুগিয়ে যাচ্ছে। জীবনের প্রয়োজনে যারা শ্রমিকবৃত্তি বেছে নিয়েছে এবং সন্তান গ্রামের বাড়িতে রেখে কষ্ট করে জীবনযাপন করছে তাদের জন্যও বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ব্যাবিলন। গরু-গাভি কর্মসূচী তারই একটি প্রতিফলন। গাভি পালন করে সেখান থেকে যা আয় হবে তা দিয়ে শিশুটির পুষ্টি নিশ্চিত করে ছোটবেলা থেকেই যেন সে ভালোভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে তার সামান্য এই অবদানটুকুও তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী স্বপ্নপূরণে সহযোগিতা করছে। কখন যে এই প্রকল্পের প্রত্যেকটি ফলফুলের সাথে নিজে জড়িয়ে ফেলেছি তার অনুভূতি আমার কাছে আজীবন অমলিন থাকবে।

রুবেলের যদিও এই প্রকল্পের সাথে সংযুক্তি নেই তবুও এই প্রকল্পের মহত্ব দেখে সে অভিভূত হলো এবং অনুধাবন করতে পারল। ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবকের সাথে সময় কাটিয়ে রুবেলের হতাশা এখন আনন্দ হিসেবে কাজ করছে। সে এ ধরনের প্রকল্পের জন্য আমি এবং আমার কোম্পানিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। অনুভূতি প্রকাশ করতে যেয়ে রুবেল আরো জানাল- বৃত্তি দেয়ার পরে কোনো প্রতিষ্ঠান যে এসব শিক্ষার্থীর বাড়িতে তাদের খোঁজখবর নেয়ার জন্য স্বশরীরে পরিদর্শন করে তার জন্যও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। রুবেল একজন ব্যাংকার তাই হয়তো ধন্যবাদের বিষয়টা মাঝে মাঝেই দিতে ভুল করে না।

নাগেশ্বরী থেকে ফেরার সময় মজনু মিয়া, তার মা, বাবা, ভাই-বোন ও অনেকেই বিদায় জানানোর জন্য প্রস্তুত যদিও বিদায় দেবার মতো খুব বেশি আতিথেয়তা করার সুযোগ দিলাম না। ছোট্ট উঠানে আমরা সবাই মিলে ছবি তুললাম। সিদ্দিক স্যার অপেক্ষা করছে আমাদের এগিয়ে দেয়ার জন্য। মাহবুব স্যার রাস্তার পাশেই দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বিদায় মুহূর্তটি আর দীর্ঘায়িত না করে বাহনে চেপে বসলাম। ফিরতি পথে রংপুরে এইচআর এর সহকর্মী অপুর বাড়িতে নাও ভেড়ানোর আবদারটা উপেক্ষা করতে পারলাম না। ভাবির খুব স্বল্প সময়ের আতিথেয়তা আমাদের মুগ্ধ করল ও ক্ষুধা নিবারণ করতে সহযোগিতা করল। বুঝতেই পারিনি আমাদের বেশ ক্ষিধে পেয়েছিল এই ভ্রমণটাতে। অপুর ছেলের সাংঘাতিক দুষ্টুমি আমাদের ভ্রমণের ক্লান্তি কিছুটা দূর করতে সহযোগিতা করল। এক কাপ চা খেতে খেতে মনে পড়ল মজনুর মায়ের মুখটি। তিনি খুবই অনাড়ম্বরভাবে তাঁর ছেলের জন্য আমার কাছে দোয়া চেয়েছিলেন এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে জানিয়েছিলেন- 'হামার ছওয়াটা মানুষ হইবে- তোমরা দোয়া করেন বায়।'